পানি দূষণে ইলিশ প্রজননে বিরুপ প্রভাব॥ প্রতিকারে করণীয়

ফারিহা হোসেন

নদীমাতৃক বাংলাদেশে পানি দূষণ ক্রমাগত বাড়ছে। একই সঙ্গে এসব দূষিত পানি নদীতে পতিত হয়ে বাড়াচ্ছে নদীর পানি দূষণ। ক্রমাগত পানি দূষণের কারণে সুস্বাদু ইলিশের বিচরণ ক্ষেত্রে তথা প্রজনন এবং উৎপাদন ব্যবস্থায় বিরুপ প্রভাব পড়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। এমনি অবস্থায় ২০১৭ সালে ইলিশ মাছ ভৌগোলিক নির্দেশক বা জিআই পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ায় ইলিশের বিশ্ব বাজার সম্প্রসারনের এই সময়ে নতুন শংকা পানি দূষণে এর উৎপাদন ব্যবস্থায় ধ্বস নামতে পারে।

পলিথিন,প্যাকেটজাত খাবারের উচ্ছিষ্ট্য,পশুবর্জ্য,মানুষের মলমূত্র প্রভৃতি অনবরত পানিতে মিশে পানিকে দূষণ করছে।এই পানি ড্রেনে গিয়ে পড়ে নিকটস্থ নদীতে। পাশাপাশি নদীন নিকটস্থ শিল্প বর্জ্য,নদীতে চলাচল কারি নৌযান,জাহাজ,বোর্ড প্রভৃতির নির্গত তরল বর্জ্যে নদীর পানিকে মারাত্নক ভাবে দূষণ করছে অনবরত। কিন্তু নদীন পানি দূষণ রোধে সরকারি সংশ্লিষ্ট সংস্থা কার্যকর কোন উদ্যোগ নিচ্ছেনা। এ কারণে ইলিশ উৎপাদনে বিরুপ প্রভাব পড়তে পারে এমন আশংকা বিশেষজ্ঞ মহলের। বিশেষ করে পদ্মা ও মেঘনা নদীতে ইলিশের বিচরণক্ষেত্রে পানির গুণগত মানের অবনতি হচ্ছে। সেই সঙ্গে কমছে ইলিশের জন্য প্রয়োজনীয় খাবারের পরিমাণ। বিশেষজ্ঞ ও গবেষকেরা বলছেন, এর ফলে ইলিশ উৎপাদনের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। ইতিমধ্যে নদীতে ইলিশের উৎপাদন কমে গেছে। এর অন্যতম কারণ, দূষণ।

ইলিশের যেসব বিচরণক্ষেত্র আছে, সেসব স্থানে পানির মান দীর্ঘ সময় ধরে দেখে আসছে সরকারের মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট নদী কেন্দ্র চাঁদপুর। এ প্রতিষ্ঠানের গবেষকেরা প্রতিবছর পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন (ডিও-ডিসলভ অক্সিজেন), পিএইচ, পানি ও বায়ুর তাপ, হার্ডনেস (ক্ষারত্ব), অ্যামোনিয়ার পরিমাণ ইত্যাদি দেখেন।

বর্ষার এই সময় ইলিশ মূলত দুটি কারণে সাগর ছেড়ে নদীর দিকে আসতে শুরু করে। একটি কারণ হলো খাবার সংগ্রহ, দ্বিতীয়টি প্রজনন। ইলিশের এই আগমনে নদীর পানির গুণাগুণ বড় নিয়ামক ভূমিকা রাখে। পানির মান ভালো হলে ইলিশের এই বিহার নির্বিঘ্ন হয়, জেলের জালেও আটকা পড়ে বেশি।

পদ্মা ও মেঘনা নদীতে ইলিশ ধরা পড়ে অপেক্ষাকৃত বেশি। সাধারণত মেঘনা নদীর মুন্সিগঞ্জের ষাটনল, চাঁদপুরের আনন্দবাজার সফর মালি, মতলবের লঞ্চঘাট, নারায়ণগঞ্জের শীতলক্ষ্যা ও মেঘনার মিলনস্থলের এলাকার পানির মান দেখা হয়। আর পদ্মার শরীয়তপুরের তারাবুনিয়া, ভোমকারা, কাছিকাটা, মুন্সিগঞ্জের মাওয়া, রাজবাড়ীর দৌলতদিয়া, পাবনার ঈশ্বরদী, রাজশাহীর গোদাগাড়ী এলাকার মান দেখা হয়।

অন্যদিকে ওয়ার্ল্ডফিশের তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বের মোট ইলিশের ৮৬ শতাংশ বাংলাদেশে উৎপাদিত হচ্ছে। ইলিশ পছন্দ করে না, এমন বাঙালি দেশে ও বিদেশে খুঁজে পাওয়া বেশ দুষ্কর। ইলিশ স্বাদে ও গুণে সত্যিই অতুলনীয়। সাগর ও নদী দুই জায়গাতেই ইলিশের বিচরণ ক্ষেত্র। বিগত বছরগুলোতে ইলিশ প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছিল এবং এমন প্রেক্ষাপটে মা ইলিশ শিকারের ওপর অবরোধসহ সরকারের নানামুখী পদক্ষেপের কারণে ইলিশের প্রজনন ও উৎপাদন বেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু পদ্মা ও মেঘনা নদীতে ইলিশের বিচরণক্ষেত্রের পানির গুণগত মান ক্রমেই অবনতি হচ্ছে। সেই সঙ্গে কমছে ইলিশের জন্য প্রয়োজনীয় খাবারের পরিমাণ।

ইলিশ গবেষকরা বলছেন, এর ফলে ইলিশের প্রজনন ও উৎপাদনের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। ইতিমধ্যেই নদীতে ইলিশের উৎপাদন কমে গেছে। এর অন্যতম কারণ নদীর পানিদূষণ। ইলিশের যেসব বিচরণক্ষেত্র আছে, সরকারের মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট নদীকেন্দ্র চাঁদপুর সেসব স্থানে দীর্ঘ সময় ধরে পানির মান পরীক্ষা করে আসছে। এ প্রতিষ্ঠানের গবেষকরা প্রতি বছর পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন (ডিও-ডিসলভ অক্সিজেন), পিএইচ, পানি ও বায়ুর তাপ, হার্ডনেস (ক্ষারত্ব), অ্যামোনিয়ার পরিমাণ ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করেন। মৎস্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, জলজ প্রতিবেশে দূষণ যেকোনো মাছের জন্যই ক্ষতিকর। তবে ইলিশ অনেক বেশি সংবেদনশীল মাছ এবং দূষণের ফলে প্রতিবেশের সামান্য পরিবর্তন ইলিশ নিতে পারে না। ইলিশ তার গতিপথ পরিবর্তন করতে পারে। পানিতে অ্যামোনিয়ার বৃদ্ধি ইলিশের খাবারের চাহিদায় পরিবর্তন করতে পারে।

সূত্র জানায়, ইলিশের বিচরণক্ষেত্রে পানির মান বিচারে অন্যতম নিয়ামক হলো পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন বা ডিও। যদি ডিওর পরিমাণ প্রতি লিটারে পাঁচ মিলিগ্রামের কম হয়, তবে তা জলজ পরিবেশের জন্য কম উপযোগী বলে বিবেচিত হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, পদ্মায় গত পাঁচ বছরে ডিওর মান কমেছে। ২০১৮ সালে পদ্মার পানিতে ডিওর গড় মান ছিল ৮ দশমিক ৭০ এবং এরপর থেকে প্রায় প্রতি বছর কমছে। ২০২২ সালে ডিওর মান ছিল ৫ দশমিক ৪১। মেঘনায় ২০১৮ সালে ডিওর গড় মান ছিল ৮ দশমিক ৪০ এবং এটি ২০২২ সালে কমে ৬ দশমিক ৮৪ শতাংশ হয়েছে। নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেনের সমন্বয়ে গঠিত একটি রাসায়নিক যৌগ হলো অ্যামোনিয়া। পদ্মায় ২০১৮ সালে পানিতে অ্যামোনিয়ার গড় উপস্থিতি ছিল শূন্য দশমিক ৪ ভাগ। কিন্তু মেঘনায় পানিতে অ্যামোনিয়ার গড় উপস্থিতি শূন্য দশমিক ২১ শতাংশ এবং এটি গত বছর শূন্য দশমিক ২৭ শতাংশ হয়েছে।

এক তথ্যে দেখা গেছে, অ্যাসিড ও ক্ষারের পরিমাপক হলো পিএইচ। জলজ প্রাণীর সহনীয় পরিবেশের ক্ষেত্রে পিএইচ সাড়ে ৭ থেকে সাড়ে ৮-এর মধ্যে থাকতে হয় কিন্তু ৭-এর নিচে নয়। পদ্মা নদীতে পিএইচের গড় উপস্থিতি ছিল ৮ এবং গত বছর এর পরিমাণ কমে হয়েছে ৫ দশমিক ৪৭। মেঘনায় ২০১৮ সালে পিএইচের উপস্থিতি ছিল ৮ দশমিক ১৩ এবং ২০১৮ থেকে ২০২২-এর মধ্যে পদ্মায় পানির তাপমাত্রা প্রায় ২৫ থেকে বেড়ে ৩০ ডিগ্রি হয়েছে। এ সময় অবশ্য মেঘনায় পানির তাপ ২৭ দশমিক ৪০ থেকে কমে প্রায় ২৭ হয়েছে। গবেষকরা বলছেন, নদীর পানিদূষণের ফলে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে ইলিশের আবাসস্থল। তা ছাড়া, মা ইলিশ অল্প বয়সেই ডিম দিচ্ছে এবং এটা অবশ্যই উদ্বেগের বিষয়। কারণ এই মাছ যখন বাচ্চা দেয়, স্বাভাবিক কারণেই সেটি ম্যাচিউরড বা পরিণত হয় না। ইলিশ গবেষকরা প্রকল্পের মাধ্যমে সরকারকে পরামর্শ দিয়েছে আগামী দু-তিন বছর সর্বোচ্চ সাত লাখ টন পর্যন্ত ইলিশ আহরণ করতে। এর বেশি করলে প্রাকৃতিক যে মজুদ আছে সেটার ওপর প্রভাব পড়তে পারে।

মা ইলিশ মূলত বছরে সাধারণত দুবার ডিম দেয়, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর (ভাদ্র মাস থেকে মধ্য কার্তিক) ও জানুয়ারি থেকে ফেব্রুয়ারি (মধ্য পৌষ থেকে মধ্য ফাল্গুন)। তবে দ্বিতীয় মৌসুমের তুলনায় প্রথম মৌসুমে প্রজনন হার বেশি। একটি মা ইলিশ প্রতি মৌসুমে একবারে সর্বোচ্চ ১ থেকে ২.৩ মিলিয়ন অর্থাৎ ১০ থেকে ২৩ লাখ পরিমাণ ডিম পাড়ে এবং নার্সিং গ্রাউন্ডে সারাক্ষণ ডিমের পরিচর্যা করে। ডিম থেকে বাচ্চা না ফোটা ও সাঁতার শেখা পর্যন্ত মা ইলিশের পরিচর্যা চলতে থাকে। ইলিশের বাচ্চা লালনপালনে বাবা ইলিশও ভূমিকা রাখে। মা ইলিশ যখন বাচ্চাদের রেখে খাদ্যান্বেষণে যায় তখন বাবা ইলিশ তাদের দেখাশোনা করে।

ইলিশ পোনা ৬-১০ সপ্তাহে ১২ থেকে ২০ সেমি পর্যন্ত বড় হয়। তখন তাদের জাটকা বলে। একটি জাটকা মাছ পূর্ণাঙ্গ ইলিশে পরিণত হতে সময় নেয় ১ থেকে ২ বছর। তখন আয়তনে ৩২ থেকে ৬০ সেমি এবং ওজনে ১ থেকে ৩ কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে। জাটকা মা ইলিশের সঙ্গে সমুদ্রে চলে যায়। সেখানে পূর্ণাঙ্গ ইলিশে পরিণত হয়ে আবার প্রজননকালে নদীতে ফিরে আসে। এত পরিচর্যার পরও মাত্র ১০-২০ শতাংশ জাটকা সমুদ্রের নোনা পানিতে সঠিকভাবে বেড়ে ওঠার সুযোগ পায়। কারণ ডিমের প্রায় ৩০ শতাংশ অন্য মাছ ও প্রাণীদের আহারে চলে যায়। ১০ শতাংশ অপুষ্টিজনিত কারণে শুরুতেই নষ্ট হয়ে যায়। পরে প্রায় ২০ শতাংশ পোনা এবং ৩০ শতাংশ জাটকা হিসেবে জেলেদের জালে ধরা পড়ে। বলা হয়, যদি ৫০ শতাংশ ডিমও যথার্থভাবে বেড়ে উঠতে পারত তাহলে বিভিন্ন নদী ও বঙ্গোপসাগরের অর্ধেকটা ইলিশের দখলে চলে যেত।

গবেষকদের মত, পানিদূষণ ও জিনগত কারণে দেশের নদীতে ধরা পড়া ইলিশের আকার ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে,এবং ডিম্বাশয়ের আকারও ছোট হচ্ছে। এতে কমছে ডিমের পরিমাণ। ইলিশ গবেষণা জোরদারকরণ প্রকল্পের তথ্য বলছে, দেশের নদণ্ডনদী ও সাগরে ইলিশের বার্ষিক সর্বোচ্চ আহরণ মাত্রা ৭ লাখ ৭০৫ টন। এর চেয়ে বেশি মাছ আহরণ হলে ইলিশের প্রাকৃতিক মজুদ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার শঙ্কায় ভবিষ্যতে ইলিশ উৎপাদনে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

যেকোনো মাছ জলজ পরিবেশের খাবারের ওপরই নির্ভর করে। ইলিশের খাদ্যের মধ্যে ৪২ শতাংশই শৈবাল। এরপরই ৩৬ শতাংশ আছে বালু বা ধ্বংসাবশেষ। বাকি খাবারের মধ্যে আছে ডায়াটম, রটিফার ও প্রোটোজোয়া। ইলিশ মাছের খাদ্য তালিকায় ২৭ প্রজাতির উদ্ভিদ কণা এবং ১২ প্রজাতির প্রাণী কণা রয়েছে। মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট নদীকেন্দ্র চাঁদপুরের গবেষণা অনুযায়ী, ২০০৬ সালের তুলনায় গত বছরের হিসাব অনুযায়ী, ইলিশের খাবারের পরিমাণ ৬ শতাংশ কমে গেছে। নদীতে ইলিশের উৎপাদনের হার কমছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে পদ্মা ও মেঘনায় ইলিশের উৎপাদনের হার আগের বছরের তুলনায় ৫৬ শতাংশের বেশি বেড়েছিল। পরের বছর এই হার ছিল প্রায় ২ শতাংশ। ২০১৮-১৯ সালে আড়াই শতাংশ। সর্বশেষ ২০১৯-২০ সালে তা কমে শূন্য দশমিক ৯৩ শতাংশ। মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের তথ্য, পদ্মা ও মেঘনা- দুই নদীর ওপরের দিকে দূষণ বেশি, তাই দুই নদীর ওপরের দিকে উৎপাদনও কমেছে।

দেশে ইলিশের উৎপাদন বাড়ছে, এটা একটা স্বস্তিদায়ক খবর, কারণ প্রজনন মৌসুমে মাছ ধরার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা দক্ষতার সঙ্গে বাস্তবায়নের কারণে ইলিশ উৎপাদন বাড়ছে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্ট ইলিশ গবেষকরা। দেশে ২০১৮-১৯ সালে ইলিশ উৎপাদন হয়েছিল ৫ লাখ ৩৩ হাজার টন। ২০২০-২১ সালে এর পরিমাণ ছিল ৫ লাখ ৬৫ হাজার টন। কিন্তু মৎস্য গবেষকরা মনে করেন, ইলিশের এই উৎপাদন বৃদ্ধিতে পানির দূষণ নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। ভবিষ্যতে নদীর পানিদূষণ ইলিশের প্রজনন হার, ইলিশের আকার এবং সার্বিকভাবে এর উৎপাদনের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। শিল্পসহ নানা ধরনের বর্জ্য ইলিশের জলজ প্রতিবেশ নষ্ট করছে। এই বর্জ্যরে সঠিক ব্যবস্থাপনা দরকার। তাহলেই ইলিশের প্রজনন ও উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

#

ফারিহা হোসেন: ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক ও কলাম লেখক

পিআইডি ফিচার